সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৭ ॥ সংখ্যা : ১ ও ২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৮ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মঙ্গলকাব্যে রন্ধনসংস্কৃতি : প্রান্তিকায়নের অভিজ্ঞান

মো. নাজমুল হোসেন*

[**সারসংক্ষেপ:** মানবসভ্যতার বিকাশের সমান্তরালে কাঁচা খাদ্যের পরিবর্তে রান্না করা খাদ্যের প্রসার ঘটে, রন্ধনপদ্ধতিতেও আসে বৈচিত্র্য, বদলে যায় রান্নার উদ্দেশ্যও। এক পর্যায়ে রান্না শুধু উদর ও রসনা পরিতৃপ্তির উপায় নয় বরং রান্না হয়ে ওঠে এলিট ও সাবলটার্নের দূরত্বের মাপকাঠি। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের রন্ধনপ্রণালিতে প্রবল ও প্রান্তিকের অপরায়ণের নানা চিহ্ন বিদ্যমান। একদিকে ক্ষমতার অধিকারী সম্পত্তিবান শ্রেণির নান্দনিক ও ব্যয়বহুল রান্নার বিপরীতে প্রান্তিক মানুষের সাদামাটা রন্ধনপ্রণালির উল্লেখ; অন্যদিকে রান্নাকে নারীর পরম কর্তব্য হিসেবে আরোপ করার পুরুষতান্ত্রিক কৌশলের উল্লেখের মধ্য দিয়ে সামন্তসমাজে দরিদ্রশ্রেণি ও নারীর প্রান্তিকায়নের যে স্বরূপ বিধৃত আছে মঙ্গলকাব্যের রন্ধনসংস্কৃতির পরতে পরতে তারই বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।]

জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষ খাবারের সন্ধানে তাড়িত হয়েছে এবং প্রকৃতি থেকে ভক্ষণযোগ্য খাদ্য নির্বাচন করে নিয়েছে। এভাবে ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তিলাভ করলেও সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার সহজাত মানবীয় বোধ থেকেই খাদ্য নির্বাচন ও প্রক্রিয়াকরণের স্বতন্ত্র পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছে মানুষ। তাই প্রাণিজগতের অন্য সবার মতো কাঁচা খাদ্য না খেয়ে, আগুনের সাহায্যে খাদ্যকে বিশেষ রূপ দান করেছে, যাকে বলা হয়েছে রান্না। কালের বিবর্তনে রান্না বা রন্ধনপদ্ধতিতেও নান্দনিকতার ছোঁয়া লেগেছে[১], তাই রন্ধনকর্ম পরিণত হয়েছে রন্ধনশিল্পে, শাস্ত্র রান্নাকে ৬৪ কলার অন্যতম হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি এ কলায় পারদর্শিতার দায় নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই রান্নার সঙ্গে জড়িয়ে যায় নারী-প্রেম-যৌনতা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতার প্রসঙ্গ।

দীর্ঘকাল ধরে বাঙালির জীবনচেতনায় বহু অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে, পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবনের আর সব দিকের মতোই 'খাওয়ারও যে ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, দর্শন আছে এবং ভবিতব্য আছে তা প্রায়ই মানুষের খেয়াল থাকে না।' (শঙ্কর, ২০১১: ৯)। এক্ষেত্রে ভূয়োদর্শী বাঙালির রন্ধনপ্রণালিতেও প্রচুর নতুন মশলা যুক্ত হয়েছে, আঁচের তারতম্যও ঘটেছে। আমরা যদি বাঙালির সৃষ্টিশীলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন মঙ্গলকাব্যগুলোর দিকে তাকাই তাহলে সেখানে মধ্যযুগের বাঙালির রান্না ও খাবারের যে বৈচিত্র্য দেখি নিঃসন্দেহে তা অবাক হওয়ার মতো। শুধু বৈচিত্র্যই নয়, 'যে কোনও জাতি বা নরগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।' (শ্রীপান্থ,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.7

২০০৪: ১১)। এদিক থেকে মঙ্গলকাব্যের রন্ধনপ্রণালির প্রতিটি ধাপে সমাজ, সংস্কৃতি ও ক্ষমতাকাঠামোর স্বরূপ উৎকীর্ণ হয়ে আছে। সেখানে অন্ত্যজ, ব্রাত্য বা অভিজাত শ্রেণির সকলেই রান্না করে, তবে কেউ রান্না করে নিছক খাদ্য উদরস্থ করার তাগিদে আর কেউ রান্না করে রসনাবিলাসের জন্য, কখনও আবার রান্না হয়ে ওঠে সংস্কারের অংশ। অর্থাৎ রন্ধন ও খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রান্তিক করে তোলার নানা কৌশল। প্রান্তিকায়ন এখানে দ্বিমাত্রিক, প্রথমত, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে শ্রেণিভিত্তিক সমাজে উত্তরণ ঘটলে সম্পত্তিবান শ্রেণির অধস্তন করা হয় সম্পত্তিহীন শ্রেণিকে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক শ্রমের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের দায়িত্বে আবদ্ধ রেখে নারীকে পুরুষের অধস্তন করা হয়। প্রথমোক্ত উপায়ে নারী-পুরুষ উভয়েই প্রান্তিকায়িত হয়েছে আর শেষোক্ত উপায়ে শ্রেণি নির্বিশেষে সব নারীই প্রান্তিকায়িত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধ কোনো খাবারের রেসিপি সংকলন নয়, বরং এখানে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল*, বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল*, জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল* এবং রায়বিনোদের *মনসামঙ্গল* কাব্যকে প্রাথমিক উৎস বিবেচনা করে, রান্না কী; কেন রান্না হয়; কার জন্য কী রান্না হয়; রান্না করেনই বা কে— এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রান্তিকায়নের স্বরূপ এবং রন্ধনপদ্ধতিতে প্রতিফলিত কেন্দ্র ও প্রান্তের অবস্থান, শ্রেণিবাস্তবতা এবং ক্ষমতাকাঠামোর বিদ্যমান বৈষম্য নির্দেশ করার প্রয়াস থাকবে।

১. রন্ধনপদ্ধতি ও রাঁধুনি

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষ নানা উপায়ে অন্নসংস্থানের প্রয়াস পেয়েছে, প্রাথমিক স্তরে মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল; ফলমূল ছিল সাধারণ খাবার। ধীরে ধীরে মানুষ নিরামিষ ছেড়ে আমিষাশী হয়ে ওঠে।[২] মানুষ সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে যে মাংস খেয়েছে তা আমমাংস হিসেবে অভিহিত হয়েছে, কারণ আগুনের অনুপস্থিতি অথবা রান্নার কৌশল না জানার কারণে কাঁচা মাংসই তারা খেয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে, আর্য-অনার্যের যে স্থূল বিভাজন করা হয়, সেখানে দেখা যায়, দেবতা এবং তাদের অনুসারী ঋষিগণ খাদ্য হিসেবে ফলমূল, দুধ ও ঘি খেতেন কিন্তু এদের বিরোধী যারা ছিল, সেই প্রান্তিক রাক্ষস, অসুর ও তাদের অনুচরেরা আমমাংস, নরমাংস অর্থাৎ বিভিন্ন ঘৃণ্য খাবার খেত। কালক্রমে ঋষিদের মাধ্যমে দুই বিপরীত খাদ্যপ্রণালির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়; আমমাংসের সঙ্গে ঘি যোগ করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হতে থাকে।[৩] তাহলে, আগুন বা তাপের সাহায্যে আমিষ বা নিরামিষ অথবা উভয়ের সমন্বয়ে সেদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে রান্না বলা যায়। শব্দকোষে রান্নার বেশ কিছু সমার্থক শব্দ আছে। অশোক মুখোপাধ্যায়ের সমার্থক শব্দকোষে রান্নার যে সকল সমার্থক শব্দ রয়েছে, তা হলো:

রান্না(ক), রন্ধন(ক), রাঁধা-, রাঁধাবাড়া(ক), রান্নাবান্না(ক), রান্ধা, রাঁধন, পাক(ক), পাককরণ, পাকানো-, পাককর্ম, পাককার্য, পাকশাক, পক্তি, অধিশ্রয়ণ, রসুই(ক), হাড়িঠেলা-।

সিদ্ধ(ক), ফোটানো-, ফটনো-, সেঝা-, সিজা, সিজানো-, সেঝানো-, ভাপানো-; সেঁকা-, ঝলসানো; পোড়ানো-, আধপোড়া করা-; জ্বাল(দে); জলমারা-, শুকনো-, সাঁতলানো-, সন্তোলন(ক), সান্তোলা; কষা-, কষে নেওয়া-, ভাজা-, ভর্জন(ক), ভুনি; ছেঁকা-, সেঁকা-।

ভর্জিত, ভৃষ্ট, ভাজিত; তেলেভাজা, তৈলপক্ক; ঘিয়ে ভাজা, ঘৃতপক্ক। (অশোক, ১৯৮৮: ৩৪)

বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে কাজটিকে। শব্দের এই বৈচিত্র্যে স্থান, কাল, ও শ্রেণিগত ব্যবধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। শ্রেণিভেদে কেউ খায় পাক বা রন্ধন করে, সেখানে থাকে নানারকম মশলা আর তেল-ঘিয়ের আধিক্য। কেউ আবার সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয় সিদ্ধ করা বা সাঁতলানো খাবারে। শ্রেণিগত দূরত্ব থেকেই কেউ রন্ধন করে আবার কেউ হাঁড়িঠেলে জীবনপাত করে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, বিস্তার ঘটে অভিজ্ঞতারও। রান্নার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে, তাহলে রান্নাকে বলা যায় সামাজিক উৎকর্ষের দ্যোতক। আর এজন্যই কাঁচা খাদ্যের পরিবর্তে রান্না করা খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া প্রসার লাভ করেছে। রন্ধনপদ্ধতির প্রসারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় বলেন:

খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিলে, তাহা অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে। কেবল যে সুস্বাদু করিবার জন্য খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিতে হয়, তাহা নহে। রন্ধন করিলে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।... বিশেষতঃ খাদ্য-দ্রব্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ বর্তমান থাকিলে অগ্নি-সংযোগে তাহা বিশোধিত হয়। এজন্য রন্ধনের আবশ্যকতা। (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ৯)

এবার আসা যাক রাঁধুনি প্রসঙ্গে, রান্না যিনি করেন তিনি 'রাঁধুনি, রাঁধিয়ে, পাচক, রান্ধনী, রন্ধনকর্তা, রন্ধনকারী, রসুইকর, ঠাকুর, বামুন, বামুনঠাকুর, সূপকার, বাবুর্চি, খানসামা, রসুইয়ে, আন্ধসিক, পাকু, পাকুক, পক্ষু, পক্তা, ঔদনিক; পাচিকা; বামুনদিদি' (অশোক, ১৯৮৮: ৩৪) প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। শব্দগুলো দেখে বোঝা যায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রান্না করতে পারেন। তবে পরিবারের রান্নার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত থাকলেও কিছু কিছু শব্দ থেকে প্রতীয়মান হয়, বেশ প্রাচীনকাল থেকেই রন্ধনকর্মকেও অনেকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এদের মধ্যে পুরুষ পাচকের সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ এসময় রন্ধনকর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক যুক্ত হয়েছিল। এ পেশা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজনের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট, যেখানে রন্ধনকারীর অবস্থান ক্ষমতাকাঠামোর নিম্নস্তরে, যিনি রান্নার স্বাদ গ্রহণ করেন তিনি স্বভাবতই ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করেন। আবার ঐতিহাসিকভাবে পরিবারে রাঁধুনি

হিসেবে নারীর উপস্থিতি সমাজকাঠামোতে তার অধস্তন অবস্থার ঘোষণা করছে, এক্ষেত্রে 'সন্তান পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে পুঁজি করে সন্তান লালন-পালন করা ও গৃহস্থালীর কর্মাদি নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।' (রাশিদা, ২০১৪: ২৪৪)

পরিবার বা সমাজের ক্ষমতাকাঠামোতে নারীর অংশীদারিত্ব না থাকলেও বাঙালি পরিবারে সাধারণত রান্নার কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ছিল নারীর হাতেই যদিও অবস্থাপন্ন পরিবারে রান্নার জন্য সহায়ক লোক নিযুক্ত করার দৃষ্টান্তও আছে।[৪] এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে, 'পুরনারীগণ যেরূপ আন্তরিক যত্নসহকারে রন্ধন করিয়া থাকেন, বেতনভুক্ পাচক দ্বারা কখন-ই সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না।' (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ৩)। অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে রান্নার দায়িত্ব নারীর হাতে অর্পণ করা হতো, এতে পুরুষের সন্তুষ্টি ও রসনাবিলাসের প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু এর পেছনে নারীকে গৃহে আবদ্ধ রাখার পুরুষতান্ত্রিক কৌশলও সক্রিয়। হয়তো এ উদ্দেশ্যেই পুরুষতন্ত্র নারীর এ কাজের প্রশংসা করেছে, নারীর রন্ধনকর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে নারীকে সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনেও বসিয়েছে। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

> আমাদের দেশে পুরনারীগণের উপর রন্ধনকার্য্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত আছে; তাঁহারা অতি পবিত্রভাবে রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।... রমণীগণই গৃহের লক্ষ্মী; অন্নপূর্ণার ন্যায় তাঁহারা স্বীয় হস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী ও আত্মীয় স্বজনকে আহার প্রদান করিলে যে, কি সুখের ও পরিতোষের কারণ হয়, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ২)

অর্থাৎ নারীর জীবনের চরম উদ্দেশ্য তার পুরুষ প্রভুর সন্তোষ বিধান, এমনটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভাবনা। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে স্বীকৃত হয়নি বরং 'নারীসত্তাকে গুণগত দিক দিয়ে নিম্নস্তরের সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নারী নিজেও এভাবেই নিজেকে জেনেছে।' (রাশিদা, ২০১৪: ২৩৯) রান্নাকে নারীর পরম কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি ধর্মকেও এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই যুগযুগ ধরে রান্নাকে নারীর ঐতিহাসিক দায়িত্বে পরিণত করা হয়েছে, সম্মতির ভিত্তিতেই নারীকে প্রান্তিক করে তোলা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর ভাবনাজগৎ এমনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছে যে, নারী ভেবেই নিয়েছে তার কাজই হবে রান্না-বান্না এবং পুরুষের সন্তান লালন-পালন করা। শৈশবে খেলাচ্ছলে রান্নার অনুশীলন করার প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, নারীমানসে আর্কিটাইপ হয়ে থাকা পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে বাল্যকালে।[৫]

মঙ্গলকাব্যের নারীরা তাদের পুরুষ প্রভুর জন্য রান্না করতে পেরে কৃতার্থ বোধ করেছে, অবশ্য রান্নায় দক্ষতা দেখাতে পারলে পুরুষের প্রশংসাও তারা পেয়েছে। কিন্তু ভর্ৎসনার তুলনায় প্রশংসার পরিমাণ নগণ্য। ভয় আর আতঙ্কে থাকতে হয়েছে তাকে; কোনো কারণে স্বামী যদি বিমুখ হয়, তাহলে সেই নারীর দুঃখের সীমা থাকত না। নারীর এই ভয়ের প্রকাশ দেখা যায় *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে, পদ্মমুখীর ভয়—

ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটু পাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥
(ভারতচন্দ্র, ১৪০৫: ৯১)

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়, কে কী খাবে। ধনী আর গরিবের খাবারে তো প্রভেদ রয়েছেই, সম্পর্কসূত্রও খাদ্যের পার্থক্য নিরূপণ করে কখনও কখনও। নারীকে এ বৈষম্যের ভুক্তভোগী হতে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যে। কর্তৃত্ববান স্বভাবতই যেখানে দাতা, সেখানে গ্রহীতা অসহায় হবে এটাই সংগত। এই সুযোগে দাতা-গ্রহীতার দান এবং চাহিদায় অপরিমেয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এ দান যদি হয় খাদ্য, সেটাও আবার সতিনের হাতের রান্না, তবে তো কথাই নেই:

পরিসে লহনা রামা করে গতায়াত।
টাটকা সরায় রামা পরিসএ ভাত॥
পুরান খুদের জাউ কিছু আছে কোন।
সকল বেঞ্জন বাঁজি না দিআছে লোন॥
রান্ধ্যাছে পুড়্যাতি গিমা কলমি কাঁচড়া।
কড়াই খুদের কিছু তুলিআছে বড়া॥
বাগ্যনের খারা লাউ কুমড়া বাকলা।
গড়ই মাছের পোঁটা মুড়া তায় মেলা॥
খল্যের বেসারি দিআ জাল দিআ দড়।
তৈল লোন নাহী তায় সান্তলন বড়॥
উড়ম্বর ফল কিছু রান্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।
কাট-সিমের বেঞ্জনে পুরিআ দিল সরা॥
দুঃখে নাহী ভুঞ্জে রামা চক্ষে পড়ে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাকল॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ১৪১)

ধনপতি সওদাগরের প্রথম স্ত্রী লহনা, সতিন খুল্লনার জন্য যে রান্না করে তাতে না আছে তেল না আছে লবণ। যে খাবার এখানে পরিবেশিত হয়েছে তা খাবার উপযোগী নয় বরং শাস্তি প্রদানের কৌশল। তাহলে বোঝা যায়, খাদ্য কখনও কখনও অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। অবশ্য এ অত্যাচারের নেপথ্যে লহনার অস্তিত্বহীনতার আশঙ্কাও জড়িত।

রান্নার কর্তৃত্ব হারানোর এ ভয় অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা ও অনিকেত ভাবনা নারীকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে। রান্না করা খাবার মুখরোচক না হলে রাধুনি তার পুরুষ প্রভুর বিরাগভাজন হতে পারে, তাই অধিকারহীনতা ও অনিশ্চয়তার যুগে পুরুষের প্রিয়ভাজন হওয়াটাই নারীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আবার নারীর রান্নার ভোক্তা স্বভাবতই

পুরুষ, এখানে চলে আসে ভোক্তার ভোগের প্রসঙ্গ। নারীর এখানেও অনিশ্চয়তা, কারণ বিগতযৌবনা নারী অপেক্ষা যৌবনবতী রমণীই পুরুষের বাঞ্ছিত। ভবানন্দের প্রথম স্ত্রী চন্দ্রমুখীর উচ্চারণে এই রূঢ় সত্য উন্মোচিত হয়েছে:

সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥
(ভারতচন্দ্র, ১৪০৫: ৯৩-৯৪)

পুরুষের সন্তুষ্টির জন্য নারীকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। কারণ, 'তার কাজ কোমল ও আকর্ষণীয়া হওয়া, বিবাহের নামে পুরুষের কাছে সম্পত্তি বিসর্জন, সন্তান লালন, পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকা অথবা উন্মাদ জীবন' (অদিতি, ২০১৪ : ২৬৩)। রন্ধনকর্মে পারদর্শিতা নারীর অন্যতম প্রধান গুণ হওয়ায় এই পরীক্ষা মঙ্গলকাব্যের নারীরা বারবার দিয়েছে, কখনও আবার এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় নারীর সতীত্বের প্রশ্ন। *মনসামঙ্গল* কাব্যে বেহুলাকে চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ হওয়ার জন্য সতীত্বের প্রমাণস্বরূপ লোহার কলাই রান্না করতে হয়েছিল। আবার *মৈমনসিংহ গীতিকার* কাজলরেখা পালায় দেখা যায়, রানি নির্বাচনের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে রন্ধনকর্মকেই। যে কাঁকন দাসীকে তার পিতা বিক্রি করেছিল ক্ষুধার তাড়নায়, সে কাঁকন দাসীর তো অভিজাত শ্রেণির রস-রুচির সংবাদ জানার কথা নয়। সে কেবল তাই রান্না করতে পারে যা তার অভিজ্ঞতালব্ধ। কাঁকন দাসী তার সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রয়াস পেলেও প্রভুর রসনার তৃপ্তিবিধান করতে পারে না। তাই যখন 'নকল রাণী পাক করিল চাইলতার অম্বল, ডৌউয়ার ঝাল, আলবনে কচুশাক— সে সব খাইয়া রাজা খুব লজ্জিত হইল' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ২৬৪)। এখানে সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও নকল রানি পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি আর তাই রাজার সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যর্থতায় রানির পদ থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে।[৬]

মৈমনসিংহ গীতিকার এ পালায় কাঁকন দাসী এবং কাজল রেখার রান্নায় শ্রেণিবৈষম্যের চিহ্ন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কাজল রেখার রন্ধন প্রণালিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। রান্নার পূর্বে মঙ্গলাচরণ ও যাবতীয় সংস্কার পালন করে সুশৃঙ্খলভাবে কাজলরেখা রান্নার পর্ব এগিয়ে নেয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেমন প্রত্যাশা করে। ফলে কাজলরেখার রান্না স্বভাবতই রাজার রসনার উপযোগী হয়। রন্ধনকর্মের দক্ষতায় কাজলরেখার আভিজাত্যের পরিচয় উন্মোচিত হলে রাজা তাকেই আসল রানি বলে স্বীকার করেন।

২. রান্নার প্রস্তুতি

বাংলা ভাষার প্রথম রান্নার বই প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে, বইটির নাম *পাক-রাজেশ্বর*। এই বইয়ে লেখক বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার জানিয়েছেন, রান্না শুরুর পূর্বেই পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে হবে, এর জন্য 'ভদ্রাসনে অগ্নিকোণে রন্ধনের ঘর/ বহুতর

ধূমপথ গবাক্ষ রাখিবে/ মস্তকপর্যন্ত ভিত্তি লেপন করিবে/ পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখা চুলা করিবেক।' (শ্রীপান্থ, ২০০৪: ১) এছাড়া, রান্নার পাত্র কেমন হবে, কোন পাত্রে কোন খাদ্য রাখা হবে, রান্নার সময় কী কী সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখতে হবে, যথা— পানি, কাঠ, আগুন ধরাবার সরঞ্জাম, হাঁড়ি ইত্যাদি। তা যেমন বলেছেন পাশাপাশি রন্ধনকর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর পরিবেশন ও আহার পর্বের যাবতীয় বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের রাঁধুনিদের মধ্যেও এমন নানা সংস্কারের প্রকাশ দেখা যায়। রান্না শুরুর পূর্বে বিবিধ সংস্কার পালনের পরই রাঁধুনি রান্নায় মনোনিবেশ করতে পারত। এ সংস্কার পালনের মনোভাব ও কারণ হিসেবে বলা যায়:

> বিনীতভাব প্রদর্শন করিলে দেবতা ও মনুষ্য উভয়েই নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই জন্য মনুষ্যদেহে বিনয় একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষ বিনীত ব্যক্তি সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। সেইজন্য রন্ধনের পূর্ব্বে প্রজ্বলিত উনুন মধ্যে একটী সুপারি ও কিঞ্চিৎ ঘৃত চিনি নিক্ষেপপূর্ব্বক ভক্তিভাবে অগ্নিদেবকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয় রন্ধনের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। (পঞ্চানন, ১৩০৯: ২)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে ঘরের লক্ষ্মী বা কল্যাণী হিসেবে দেখতে চায় আবার নারীই অন্নপূর্ণা এমনকি 'সংসার সুখের হয় রমণির গুণে।' অর্থাৎ নারী একাধারে নতি, আনুগত্য, পেলবতা, নম্রতা, চারুতার মূর্তি আবার বিপন্নপ্রাণের প্রাণদায়িনী ত্রাতা। সমাজ রান্না-বান্না এবং সন্তান প্রতিপালনের কাজ নারীর ওপর আরোপ করেছে। নারীর কাঁধে যখন এতসব দায়িত্ব, তখন স্বাভাবিকভাবেই নারীকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বভাবতই ভোগাকাঙ্ক্ষী, ফলে নারীর আনুগত্য ও মৌনতাকে উপভোগ করেছে। আর পুরুষতান্ত্রিক অভিজ্ঞানে স্নাত নারী রূপ-সৌন্দর্য, কর্মদক্ষতা, মমত্ববোধে জাগ্রত হলেও পুরুষতন্ত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করে স্বাধীন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি; ফলে দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ মঙ্গলকাব্যের গৃহিণীদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না, বিভিন্ন সময় নারীদের স্বামী সম্পর্কে অনুযোগ থাকলেও তা উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। বরং পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত সাংস্কৃতিক বৃত্তে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে রান্না শুরুর পূর্বেই নারী দৈব সহায়তা কামনা করে, তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্বাহ করার সক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায়। রান্নার জন্য উপযুক্ত জ্বালানী সংগ্রহের পাশাপাশি, হাঁড়ি চুলায় বসানো, চুলায় অগ্নি প্রদান সবকিছুই তাঁকে করতে হয় মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়, রান্নার পূর্বে দৈবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে নারীরা চিনি, ঘি, ধূপ, জবা প্রভৃতি দিয়ে অগ্নিপূজা করার পরই রান্না শুরু করছে এই ভেবে যে, অগ্নি সন্তুষ্ট হলে সকল দেবতাও সন্তুষ্ট হবে, কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না বরং রাঁধুনির মনঃকামনা— খাদ্যের প্রাচুর্য ও পুরুষের সন্তুষ্টি অর্জন— পূর্ণ হবে। এছাড়া নারীর আকাঙ্ক্ষা:

> পাতলা সুন্দরের কাষ্ঠ শুকনা তেতুঁলী।
> পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে অগ্নি জ্বালি॥
> অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বর দান।

মুই যেন রন্ধন করি অমৃতের সমান॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন।
ডানদিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

রান্নার পূর্বে নারীর এমন ভক্তিভাবের উদ্রেক কি শুধুই সংস্কার? মনে হয় না। কারণ ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ চিরকালই খাদ্যের নিশ্চয়তা কামনা করেছে। ক্ষুধা থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে, এই কামনা বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। উপনিষদে আছে 'অশনায়য়াহশনায়া হি মৃত্যুঃ' (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ২:২:১) অর্থাৎ ক্ষুধাই মৃত্যু। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন:

> বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে, দেশে ফসল বেশি হলেও তার ভাগ পায়নি, কম হলে তো অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, না হলে মৃত্যু এসেছে 'অশনায়াপিপাসে'র চেহারায়। (সুকুমারী, ২০০২: ১০৪)

ক্ষুধার রূপ ধরে মৃত্যু বাঙালির জীবনে হানা দেয় বারবার। বাঙালি নারীর আকাঙ্ক্ষা তাই সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা, খাদ্যের নিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা। অভাব থেকে মুক্ত সচ্ছল জীবনের প্রত্যাশা থেকেই তারা দৈবের শরণ নিয়েছে। আর ক্ষুধারূপ মৃত্যুর ভয়েই হয়তো বাঙালি নারী দেব-দ্বিজ কাউকেই রুষ্ট করতে চায়নি। প্রাণধারা বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষায় নারী এখানে 'মাতৃরূপেণসংস্থিতা', যিনি মৃত্যু বিতাড়নকারিণী এবং প্রাণময়ী। তাই রান্নার সঙ্গে ধর্মবোধকে জুড়ে দেওয়া—

> তাঁহারা (প্রাচীনা যোষিদগণ) রন্ধনের পূর্ব্বে কিছুমাত্র আহার না করিয়া, ভক্তির সহিত রন্ধন করিয়া থাকেন এবং ভোক্তাদিগের আহার সমাপ্ত হইলে জল গ্রহণ করেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয় রন্ধন কার্য্যেও সেইরূপ ভক্তি সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ৪)

লক্ষ্মী চঞ্চল, আর নারীই যেহেতু ঘরের লক্ষ্মী, অতএব লক্ষ্মীর অনুপস্থিতির দায়ও নারীর। সেই দায় থেকেই দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের সমৃদ্ধি ও অভাব দূর করতে নারী যাবতীয় সংস্কার পালন করছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও অন্নাভাবের ভয় থেকে মুক্তির জন্যই মঙ্গলকাব্যের নারীরা খাদ্যের সমৃদ্ধির জন্য আকুতি জানিয়েছে। তাই বাঙালি নারীর ব্রতকথায় দেখি, নারীর আকাঙ্ক্ষা 'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' (অবনীন্দ্রনাথ, ১৪০২: ৯)

অন্যদিকে দৈব চিরকালই সমর্থবানের সহায়। তাই বিত্তবান চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা যখন বাসরঘরে রান্নার উদ্যোগ নেয় তখন দৈব সহায়তায় খুব সহজেই রান্নার উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে যায়। রান্নাও হয়ে যায় দৈব উদ্যোগে। অন্নপূর্ণা কর্তৃক বেহুলার রন্ধনের সামগ্রী যোগান আসে, যা বণিকের অর্থনৈতিক সচ্ছলতারই দ্যোতক। জগজ্জীবনের কাব্যে দেখা যায়:

মঙ্গল চাউল আর ভৃঙ্গারের পানি।
চণ্ডিকা স্মরণ করি রান্ধে বানিয়ানী॥
যে দিগে বাঢ়ায় হাত বাছোর নন্দিনী।
অন্নপূর্ণা নানা দ্রব্য যোগান আপনি॥
(জগজ্জীবন, ১৯৬০: ২১৭)

দেবী স্বয়ং সওদাগরের পুত্রবধূর রান্নার উপকরণের ব্যবস্থা করছেন অর্থাৎ সমাজে দৈবের স্থান দখল করছিল অর্থনীতি, তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। তবে এ কাব্যেও বেহুলাকে শেষপর্যন্ত প্রাণদায়িণী শক্তি হিসেবেই আবির্ভূত হতে দেখা যায়, নারীর এই শক্তির আরাধনা করেছে পুরুষ বিভিন্ন সময়। কেননা, পুরুষতন্ত্র পুরুষের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করলেও মানবীয় শক্তি যে প্রেম, সেখানে নারীর একাধিপত্য।

৩. রান্নার প্রকারভেদ

সমার্থশব্দকোষে আমরা রান্নার একাধিক সমার্থক শব্দ দেখি, প্রতিটি শব্দই বিভিন্ন ব্যঞ্জনা ধারণ করে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন শক্তির আর শক্তি আসে খাদ্য থেকে, আর খাদ্য তখনই রসনাকে তৃপ্ত করে যখন তা রান্না করা হয়। এই আয়োজন কখনো করা হয় শুধু পরিবারের ব্যক্তিবর্গের জন্য, আবার কখনও অধিক সংখ্যক অতিথির জন্য। মঙ্গলকাব্যেও রান্নার আয়োজনের বিভিন্ন রকমফের দেখা যায়। প্রধানত রান্নাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—

ক. নিত্য বা প্রাত্যহিক রান্না;
খ. আনুষ্ঠানিক বা ভোজ রান্না।

মঙ্গলকাব্যগুলোতে প্রাত্যহিক বা নিত্য রান্নার উল্লেখ নেই বললেই চলে, সেখানে রান্নার যে চিত্র আছে তা প্রধানত ভোজ রান্নার চিত্র মাত্র। প্রাত্যহিক রান্না মঙ্গলকাব্যের কবিদের দৃষ্টিতে গুরুত্ব পেল না কীভাবে, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বে। আরিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্বে প্লট সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছিলেন:

> এটি একটি ক্রিয়ার অনুকরণ— সেই ক্রিয়াটি হবে একক এবং সমগ্র, তার অন্যান্য অংশগুলি এমনভাবে সাজানো হবে যে, তাদের একটিকেও যদি পরিবর্তিত করা হয়, বা পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে সমস্ত কাহিনীটিই হবে বিচ্যুত ও বিধ্বস্ত। (শিশির, ২০০৯: ৫৫-৫৬)

অর্থাৎ জীবনের নির্বাচিত কিন্তু অপরিহার্য ঘটনাই প্লটের অন্তর্ভুক্ত হবে। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখি রন্ধনকর্মের নানা ঘটনা বিধৃত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক রান্নারও আবার বিভিন্ন প্রকার আছে, বিভিন্ন নাম আছে। কখনও বিবাহ অনুষ্ঠানের ভোজ, কখনও গর্ভবতী নারীর সাধ ভক্ষণ উপলক্ষে ভোজ, আবার কখনও বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে

ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। রান্না আবার কখনও নারীর পরীক্ষা হিসেবে সংঘটিত হয়। আনুষ্ঠানিক রান্নার চিত্রই মধ্যযুগের কবির বর্ণনায় প্রধানত উঠে এসেছে। ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন সামর্থ্যবান না হলে সম্ভব নয়। সংগত কারণেই বোঝা যায়, যে শ্রেণি রান্নার আয়োজন করেছে বা যাদের জন্য করেছে, তারা সামাজিক অবস্থান ও বিত্তকৌলিন্যে সমাজের উচ্চকোটিতে অবস্থান করছে। এরা খাওয়ার জন্য বাঁচে তাই রসনাবিলাস এদের জন্য অপরিহার্য, রান্নার স্বাদের মানদণ্ড এদের হাতে। এ অভিজাত শ্রেণিরও প্রাত্যহিক রান্নার দৃশ্য মঙ্গলকাব্যের কবির বর্ণনার বিষয় হয়নি, হয়তো তা জীবনের নির্বাচিত অপরিহার্য ঘটনার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যাদের প্রাত্যহিক রান্নার বর্ণনা পাই তারা নিতান্তই দরিদ্র, সমাজের প্রান্তিক অসহায় মানুষ, তারা বেঁচে থাকার জন্য খায়। সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন ঘটনাবিরল হওয়াতেই বোধ হয়, তাদের প্রাত্যহিক রান্নার দৃশ্য কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। অথবা বলা যায়, রান্নায়— যেখানে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট— দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য আরও প্রকটভাবে ধরা দেয় বলে কবি তা প্রকাশের লোভ সংবরণ করেননি। অর্থাৎ প্রান্তিকায়নের কৌশল হিসেবেই এদের রান্নার দৃশ্য চিত্রণে কবি উদারতা দেখিয়েছেন।

৩.১ প্রাত্যহিক রান্না

বাঙালির নুন আনতে পানতা ফুরায়, ঘরে সদস্যসংখ্যার অনুপাতে রান্না করা খাবার অপ্রতুল হয়ে ওঠে। কিন্তু খাবারের যোগান কম, তাও সংগৃহীত হয়েছে কষ্টেসৃষ্টে। খাবারের এমন সংকট সীমাহীন দারিদ্র্যের চিহ্নায়ক। এ অভাবের কাছে দেবতারাও অসহায়। স্বয়ং অন্নপূর্ণা, যাকে স্মরণ করে সাধারণ নারীরা রন্ধনকর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে-অন্নপূর্ণাও অভাবের জন্য সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থ হন। এখানে স্পষ্টতই দুর্গা আর দেবী নন, নিতান্তই সাধারণ গৃহিণী অথবা প্রান্তিক মানুষের দেবী, যার স্বামী অলস, অকর্মণ্য। দেবীকেও অন্নাভাব সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর কষ্টের কথা শোনা যায় *মনসামঙ্গল* কাব্যে:

> [illegible] চাহিয়া যার ঘরে যেবা পাই।
> [illegible] কচু সন্ধ্যাকালে রন্ধন চড়াই॥
> [illegible] পাতিলে অন্ন উতলায়া ফুটে।
> অন্ন হৈল বোলি বুড়া পায় ধুঞা উঠে॥
> ভাঙ্গের তিয়াগে বুড়া সকল অন্ন খায়।
> কার্ত্তিক গণেশ পুত্র খিদাএ লালাএ॥
> (জগজ্জীবন, ১৯৬০: ৩০০)

আবার *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কালকেতুর তিন হাঁড়ি আমানি, চার হাঁড়ি খুদ জাউ, ছয় হাঁড়ি লাউমিশ্রিত সুপ, দুই-তিন বুড়ি আলু-ওল পোড়া এবং দধি দিয়ে তিন হাঁড়ি ভাত খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও, অসম্ভব নয়। কেননা, কালকেতু ব্যাধ,

পরিশ্রমজীবী, মৃগয়ার জন্য তার শক্তির প্রয়োজন এবং পশুদের পরাজিত করার মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্ব টিকে থাকে; অধিক খাবার না খেলে সে শক্তি পাবে কোথায়!

দরিদ্রের খাদ্যতালিকা যেমন প্রশংসনীয় নয়, তেমনই খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াও দৃষ্টিকটু। তাই ব্যাধ কালকেতুর খাবারে যেমন দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে, তেমনই তার খাদ্যগ্রহণও বীভৎস রূপে চিত্রিত হয়েছে। আমানি, আলু-ওল পোড়া খাবার অতিশয় আনন্দে গ্রহণ করলেও, সবসময় তা জোটে না। তাই প্রয়োজন পড়ে ঋণ করার। অবশ্য বড় কোন কিছু নয়, কাঁজি রান্নার খুদ এবং সামান্য লবণ ধার পেলেই কালকেতুর পরিবার কৃতার্থ হয়। সীমাহীন অভাব ও সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বাস্তবচিত্র ধরা পড়ে ব্যাধ কালকেতুর কল্পনায়:

খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে।
কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে॥
রান্ধিবে মুড়্যাতি সাক হাঁড়ি দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর্য্য রিন॥
... ...
গোধিকারে বান্ধিআছি রাখি জালদড়া।
ছাল খসাইআ প্রিয়ে কর্য্য শিকপোড়া॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ৫৫)

আর খুদের কাঁজি ও শাকের সঙ্গে গোধিকা বা গুইসাপের মাংস পুড়িয়ে খাওয়াই কালকেতুর প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকা; এমন খাবার প্রান্তিক শবরদের জন্যই নির্ধারিত। একই কাব্যের ধনপতি সওদাগরের খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেও কালকেতু জীবনে খাদ্যাভাব নিত্যসঙ্গী ছিল। এ চিত্র পুরো মধ্যযুগের সমাজের বৈষম্যকেই প্রতিফলিত করে।

৩.২ আনুষ্ঠানিক রান্না

বাঙালির জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উৎসবময়, আর এ উৎসবের সূত্রপাত সন্তান যখন গর্ভে আসে তখন থেকেই। বিশেষ করে নারীর সাধ ভক্ষণ, সন্তান জন্মের পর অন্নপ্রাশন বা মুখে ভাত, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সবগুলো অনুষ্ঠানের অনিবার্য অংশ ভোজ। এছাড়াও অন্যান্য নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভোজের আয়োজন অহরহ লেগেই থাকে।

সাধ

ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রে যারা বাস করে তাদের রান্নায় দেখি 'ঘি মশলার শ্রাদ্ধ', এমনকি শাক রান্নার জন্যও ঘি অপরিহার্য। কিন্তু প্রান্তিক যারা, তাদের রান্নায় তেলের ব্যবহারই দুর্লক্ষ্য, ঘি তো তাদের কল্পনার বস্তু। সেদ্ধ এবং পোড়া, তাদের রান্নার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে গর্ভবতী নিদয়া তার সাধের যে খাদ্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে তাতে আছে জামির বা লেবুর রসমিশ্রিত পোড়ানো মাছ ছাড়াও—

আমার সাধের সীমা ইচিঙ্গা পলতা গিমা
বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।
ঘন কাঠি খর জ্বালে সান্তলিবে কটু তৈলে
দিবে তায় পলতার শাক॥
পুই ডগি থুপি কচু ফুলবড়ি দিবে কিছু
দিবে তায় মরিচের ঝাল।
হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল॥
লোন কিছু দিবে বাড়া নেউল গোধিকা পোড়া
হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া।
কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া
সসারু করহ শিকপোড়া॥...
মূলাতে বার্তাকু সিম তাহে দিআ রান্ধ নিম
আর দেহ ডম্বুরের ফলা॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ৪০)

সাধ শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা বাসনা। যেকোনো মানুষের ইচ্ছা বা বাসনা থাকে প্রাত্যহিক জীবনে যা সাধারণত পাওয়া যায় না, তার প্রতি। নিদয়ার সাধ ভক্ষণের ইচ্ছার মধ্যে প্রান্তিক মানুষের যে স্বপ্ন-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, তা তার অভিজ্ঞতাজাত। বলা যায় নিদয়ার স্বপ্নগুলোও দারিদ্র্যের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি ও শবরদের সহজলভ্য কিছু প্রাণীর মাংস এবং মাছ নিদয়ার সাধের তালিকায় থাকলেও, সে যেভাবে রান্না করতে বলেছে সেখানে ঘি তো অকল্পনীয় বটেই, তেলের পরিমাণও নিতান্ত কম। ঝলসানো বা পোড়া এবং সেদ্ধ করার মধ্যেই তাদের রান্না সীমাবদ্ধ।

আবার ধনাঢ্য বণিকের স্ত্রী খুল্লনা। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে নিদয়ার চেয়ে অনেক উপরে তাঁর স্থান, ফলে শাক-নিরামিষ থাকলেও খুল্লনার সাধের খাবার রান্নার প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। খুল্লনার সাধ—

দেখি জেমন সোনা শকুল মৎস্যের পোনা
গোটা কাসন্দি দিবে তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাজি উদর পুরিআ ভুজি
বন-সাকে বড় সুখ তথি॥
ঘোলে মিশাইআ লাউ দুগ্ধ তিলে গুড়ে জাউ
পিঠা কর খির নারিকেলে।
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ২১৫)

দেখা যাচ্ছে, খুল্লনার সাধের আয়োজন আড়ম্বরপূর্ণ। কিন্তু সেখানেও নিদয়ার মতো সাধারণ মানুষের খাবারের সঙ্গে মিল রয়েছে; হয়তো গর্ভবতী নারীর সাধ ভক্ষণের প্রত্নস্মৃতি লুকিয়ে আছে। মিলের বাইরে অমিলও রয়েছে এবং সেটা স্পষ্টতই অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত। নিদয়ার প্রত্যাশা ছিল বিভিন্ন বন-শাক কটু তৈলে সাঁতলে খাওয়ার কিন্তু খুল্লনার প্রত্যাশা আরো বেশি। খুল্লনার বাঞ্ছিত ব্যঞ্জনে জোয়ান, হিঙ্গ, জিরা, মেথি প্রভৃতি মশলার ফোড়ন প্রয়োজন হয়, তা না হলে খাবার মুখরোচক হবে না। এছাড়া শকুল অর্থাৎ শোল মাছের পোনা, যা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল অতএব এই মাছের পোনা সাধারণের সহজলভ্য নয়। আবার শোল মাছের পোনা রান্নার যে পদ্ধতি খুল্লনা নির্দেশ করেছে, তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল, প্রান্তিকশ্রেণির নাগালের বাইরে।

আরেক ধরনের আনুষ্ঠানিক রান্নার কথা শোনা যায়, যাকে বলা হয় ভোজ। ভোজ নানা কারণে অনুষ্ঠিত হয়েছে, কখনও বা বিয়ে উপলক্ষ্যে, কখনও বা বণিকের ব্যবসায়িক সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আবার কখনও রাজার বিজয় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। এসব ভোজ উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ রান্নার আয়োজন করা হতো। প্রাত্যহিক জীবনে যা খাওয়া হতো, ভোজে সেসব খাবার চলত না। কারণ—

> নিত্য ভোজনের দ্রব্য সহজ অর্থাৎ লঘু-পাক হওয়া উচিত। নিত্য খাদ্য গুরুপাক হইলে, নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা।... উৎসবাদি অর্থাৎ ভোজে যে সকল খাদ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নিত্য খাদ্য হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভোজে অত্যন্ত গুরুপাক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ১৫)

৪. খাবারের পদ

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে খাদ্যাভ্যাসে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র খাদ্যাভ্যাস ও রন্ধনপ্রণালির প্রচলন ঘটেছে। 'ফলতঃ দেশের প্রকৃতিভেদে ও লোকের রুচি অনুসারে খাদ্য দ্রব্য নির্ব্বাচন ও পাকের ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়।' (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ১)। খাদ্য যখন আর ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় না হয়ে রসনাবিলাসের উপাদান হয়ে ওঠে, তখন ভোক্তার রস-রুচিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় জানান:

> ভোক্তার রুচি অনুসারে রন্ধনের ব্যবস্থা হওয় আবশ্যক। সকলে একপ্রকার নিয়মে ঘৃত-মসলাদি ব্যবহার করে না; কেহ অধিক পরিমাণে ঘৃত-পক্ক-দ্রব্য আহারে সন্তুষ্ট, কেহ লঘু-পাক আহারে তুষ্ট, কেহ ঝাল অল্প পরিমাণে ভালবাসিয়া থাকে, কেহ বা আদৌ ঝাল ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহে; সুতরাং একরূপ নিয়মে কখনই পাক-কার্য্য চলিতে পারে না। (বিপ্রদাস, ১৩১৩: ১১)

মঙ্গলকাব্যগুলোতে যেসব খাবারের পদ রান্নার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো প্রধানত আমিষ পদ এবং নিরামিষ পদ। নিরামিষ পদে সাধারণত দেখা যায় শাক, সবজি এবং ডাল

রান্নার বিবরণ। আমিষ পদের মধ্যে আছে মাছ এবং মাংস। পাশাপাশি আছে বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত এবং শেষপাতে দেবার জন্য বিভিন্ন মিষ্টান্ন।

আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকারের খাদ্য রান্নার ক্ষেত্রেও সময়ের ধারাবাহিকতায় বৈচিত্র্য এসেছে। মানুষ স্বভাবতই স্বাদে নতুনত্ব যুক্ত করার প্রয়াসী, আমিষ-নিরামিষের স্বতন্ত্র পদ রান্নার পাশাপাশি বিভিন্ন সময় আমিষ রান্নায় নিরামিষও যুক্ত করেছে। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী জানান :

> যেমন স্বরবর্ণ ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ হইতে পারে না, সেইরূপ আমিষাহারও নিরামিষের সাহায্য ব্যতীত রন্ধন হইতে পারে না। কিন্তু নিরামিষের সাহায্য রন্ধনে আমিষের প্রয়োজন হয় না। যেমন স্বরবর্ণের সাহায্যার্থে ব্যঞ্জনবর্ণের আবশ্যকতা নাই। (প্রজ্ঞাসুন্দরী, ১৩০৭: ভূমিকা ২)

রান্নার এ সমীকরণ সমাজধর্মের সমান্তরাল হিসেবে দেখা যেতে পারে। নিরামিষ সাধারণত দরিদ্র মানুষের আহার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আমিষের স্বাদ তারা কমই পেয়েছে। আবার যেটুকু আমিষ তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল উচ্চবর্গের মানুষের কাছে তা নিতান্তই তুচ্ছ অথবা ঘৃণার্হ ছিল। অতএব নিরামিষ প্রান্তিকশ্রেণির প্রধান অবলম্বন ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অভিজাত শ্রেণি তাদের আমিষ রান্নায় স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য নিরামিষ যুক্ত করেছে, নিজেদের সুবিধার জন্য অভিজাতেরা সমাজের নিম্নবর্গকে যেমন ব্যবহার করে।

৪.১ নিরামিষ

আরণ্যক মানুষ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে আমিষ গ্রহণ শুরু করে। আর্যদের ইতিহাসের গোড়া থেকেই মাংস খাওয়ার ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিজেদের শক্তি ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যখন পশুশক্তি সংরক্ষণ জরুরী হয়ে উঠল, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মাংসাহারের পরিবর্তে মানুষকে নিরামিষের দিকে ধাবিত করা হলো। উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি মাংস তথা আমিষ আহারে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও নৈতিকতার প্রচার করলেও, বাংলায় সেসব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারেনি। মাছ-মাংস প্রভৃতি আমিষ খাওয়ায় উত্তরভারতীয় সংস্কৃতানুসারী ব্রাহ্মণেরা এ অঞ্চলের মানুষকে ঘৃণা করলেও আমিষ আহার এ অঞ্চলে সবসময়ই ছিল কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আর সংস্কারের কারণে আমিষের পরিবর্তে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করার প্রবণতাও যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেন:

> মাছ মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বিধবা-সহ কারো কারো বাছবিচার থাকায় সেকালের গৃহিণীরা মাছের চেয়েও বেশি বৈচিত্র্য এনেছিলেন নিরামিষ রান্নায় এবং বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন তৈরিতে। (মুরশিদ, ২০০৬: ৪৮৬)

শাক

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে দেখা যায়, শাক চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন শচীদেবী বিভিন্ন প্রকার রান্না করেছিলেন:

আই জানে — প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে॥
(বৃন্দাবন, ১৯৯৫: ৩২৭)

চৈতন্যদেব শাকের মহিমাও বর্ণনা করেছিলেন, সেখান থেকে শাক খাওয়ার দার্শনিক গুরুত্ব তৈরি হলেও, শাক শেষপর্যন্ত দীন-হীনের খাদ্য হিসেবেই পরিগণিত হয়। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান শাকের প্রচুর পুষ্টিকথা জানালেও, মাছ-মাংস পেলে শাক সহজে কেউ খেতে চায় না। এ প্রসঙ্গে সিরাজ সালেকীন বলেন:

> সচরাচর কারা খাবে শাক? খাবে দরিদ্ররা, মাছ মাংস, দুধ-ঘি, পায়সান্ন যাদের আয়ত্তের বাইরে। এরা বাধ্যতামূলক শাকভোজী— শাকমাত্র ভোজনে জীবনধারণ করে, জীবনের সরলতা সন্ধানের জন্য দার্শনিক চিন্তার জায়গা থেকে শাকাহারী নয়। (২০২১: ৫৫)

সাধারণত নিরামিষ পদ প্রথমে রান্না করা হতো, পরে আমিষ পদ। এর মধ্যে আবার শাক রান্না হতো একেবারেই শুরুতে। শাক নিরীহ খাবার, তাই তা রান্নার জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন পড়ে না। তাই নিদয়া তার সাধের খাবার রান্নার নির্দেশ দেয় তাতে ইচিঙ্গা, পলতা, গিমা, বোয়ালি, পলতা, পুঁই প্রভৃতি শাক রান্নার কথা আছে। এর মধ্যে ইচিঙ্গা, পলতা, গিমা, বোয়ালি একত্রে ঘেঁটে নিয়ে ঘন ঘন কাঠি দিয়ে নেড়ে বেশি জ্বালে কটু অর্থাৎ সরিষার তেলে সাঁতলানোর কথা বলা হয়েছে। আবার পুঁই, কচু প্রভৃতি শাকে মরিচের ঝাল বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এ রান্না স্পষ্টতই দরিদ্রের জন্য।

তবে রান্না যখন অভিজাতের জন্য, তখন রান্নার প্রণালিও বদলে যায়। এক্ষেত্রে কেন্দ্র-প্রান্তের বৈষম্য প্রতিফলিত হয় রান্নার ফোঁড়নে। বণিকপত্নী খুল্লনার সাধেও শাক রান্না করা হয়, তবে তা মোটেও ব্যাধ পরিবারের মতো নয়। খুল্লনার সাধ রান্নায় দেখা যায়—

লতা পাতা বন-শাক খরজালে কর‍্যা পাক
সান্তলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।
সন্তলন বলি তথি হিঙ্গ জিরা দিআ মেথি
বনি বলি জদি কর দআ॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ২১৫)

শাক এখানে রান্না হচ্ছে ভিন্নভাবে। কটু তেলে নয় বরং বিবিধ মশলার সমন্বয়ে এখানে শাকে ফোঁড়ন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জোয়ান, হিঙ্গ, জিরা, মেথি প্রভৃতি মশলা খাবারের দুর্গন্ধ দূর করে স্বাদ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু এগুলো সচরাচর সাধারণের হাতে আসে না।

শাক যখন অভিজাতের জন্য রান্না হয়, তখন ঘিও যুক্ত হয়, যা শাক রান্নায় অপরিহার্য নয়। অন্যসব রান্নার মতো এ শ্রেণির রান্নায় ঘি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, শাকে ঘি ব্যবহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্যোতক হিসেবেই অধিক গ্রহণযোগ্য। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে আরও দেখি:

রন্ধন করিতে হইল লহনার ত্বরা।
ঘৃত পুর‍্যা রাখে রামা কুঁড়িয়া পাথরা॥
ঘৃতে জবজব রান্ধে নালিতার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় পাক॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ১৫০)

শাক রান্নায়ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রয়েছে। বিভিন্ন শাকে ঘি, জোয়ান, আদা, হিং, জিরা, মেথি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মশলার ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কুমড়া শাক রান্নায় নারিকেলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়:

জমানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক॥
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা॥
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক।
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

খাদ্যের অভাবে মানুষ অসুস্থ হয়, কখনও আবার খাদ্যের জন্যও অসুস্থ হয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকার ঔষধিগুণসম্পন্ন খাদ্য রান্নারও উল্লেখ আছে। নালিতা বা পাটশাকের স্বাদ তিক্ত, যদিও তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তাই এ শাক শুকিয়ে সুক্তো তৈরি করা হয়। নিরামিষ রান্নার প্রথমেই সুক্তো এবং তিক্ত স্বাদের শাক রান্না করা হয়। এছাড়া জ্বর, পিত্ত থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার পাঁচনও রন্ধন তালিকায় যুক্ত হয়েছে:

জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

বর্তমানকালে রান্নার ক্ষেত্রে খাবারের পুষ্টিগুণ অনেক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে, মধ্যযুগেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ খাবারের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যে

দেখা যায়, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং রসনাবিলাস ছাড়াও খাবারের ঔষধিগুণের দিকেও রাঁধুনির সজাগ দৃষ্টি ছিল।

সবজি

নিরামিষ রান্নার ধারাবাহিকতায় শাকের পর শুরু হয় সবজি রান্না। সবজি কোনোটা সিদ্ধ করা হতো, কোনোটা পোড়ানো হতো, কোনোটা ভাজি করা হতো, আবার কোনোটার ব্যঞ্জন রান্না করা হতো। এক বা একাধিক সবজি দিয়ে ব্যঞ্জন রান্নারও প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে মঙ্গলকাব্যে।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে দেখা যায়, পটলের শাক (পোলতা) মিশিয়ে বেগুন রান্না করা হয়। বেগুন রান্নায় বেতাগ শাকের ব্যবহারও দেখা যায়, আবার বেগুন পুড়িয়ে কটু তেলে রান্নাও হয়। সরিষার তেলে কুমড়োর ফালি ভাজা হয়। কাঁঠালের আঁটি দিয়ে ভাজা হয় ঝিঙ্গা 'পোলাকারি'। বরবটি রান্নায় মরিচের ঝাল ব্যবহার করা হয়। দুধ দিয়ে লাউ, নারিকেল দিয়ে কুমড়া, সুক্তা পাতা দিয়ে কলাইর ডাল রান্না করা হচ্ছে। রান্নায় সাধারণত কটু বা সরিষার তেলের ব্যবহারই দেখা যাচ্ছে। আবার সরিষা বাটা দিয়েও কিছু কিছু রান্না করা হয়, যেমন— কলার থোড় বা পানিকচু, এক্ষেত্রে সরিষা বাটা এতটাই সাদা যে তা দুধের দইকেও হার মানায়। বিজয়গুপ্ত বর্ণনা করেন:

রান্ধিছে রান্ধনী না দেয় গা মোড়া।
ঝাঁজ কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া॥
বাটী বাটী ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
কলার থোর রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই॥
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুগ্ধের দৈ।
সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানিকচুর বৈ॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

রায়বিনোদের কাব্যে আবার কচি কুমড়ার ফালি, আলু, আস্ত পটল ঘিয়ে ভাজতে দেখা যায়। এখানেও সকল রান্নাই ঘি ব্যবহারের প্রবণতা থেকে রায়বিনোদের শ্রেণিচরিত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি বলেন:

নিরামিষের ব্যঞ্জন তবে রান্ধিল সুন্দরী।
সুপক্ব করিয়া রান্ধে ঘৃতেত সম্ভারী॥
(রায়বিনোদ, ১৯৯৩: ২৭৮)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায়, ২৩ প্রকারের নিরামিষ পদ রান্না হচ্ছে যেখানে বড়া, বড়ি, কলা-মুলায় নারিকেলের ব্যবহার করা হয়েছে এবং কলার থোড়ে দুধ মিশিয়ে ডালনা, শুক্তানি ও ঘন্ট রান্না করা হয়েছে। এছাড়া লাউ, বার্তাকু (বেগুন) আর কুমড়া রান্নায় দেখি তিলের ব্যবহার।

ডাল

নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, প্রাচীনকালে বাঙালি ডাল খেত না, কিন্তু কালের বিবর্তনে ডাল বাঙালির খাদ্যতালিকায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডাল না থাকলেও স্যুপকে আমরা ডালের পূর্বসূরি ধরে নিতে পারি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার ডালের নাম পাচ্ছি। যথা— ছোলা, অড়হর, মুগ, মাষ, বরবটি, বাটুলা ও মটর ইত্যাদি।

ডাল রান্না অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হলেও রান্নায় দক্ষতা না থাকলে ডাল রান্না নিয়ে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। এমনিতে 'সামান্য হলুদ-মরিচ, সংস্কার না থাকলে পেয়াজ-রসুন সহযোগে সিদ্ধ করলেই ডাল প্রস্তুত। আরও একটু আকর্ষণীয় করতে চাইলে পেয়াজ, তেজপাতা বা পাঁচফোড়নের ফোড়ন, এটা ঐচ্ছিক।" (সিরাজ, ২০২১: ৬৬)। মঙ্গলকাব্যে দেখি, কিছু কিছু ডাল ধীর জ্বালে কোনোটা বা খরজ্বালে রান্না করতে হয়। মুগের ডাল উচ্চতাপে গললেও কলাইর ডাল রান্নার জন্য শম্বুকগতি অর্থাৎ ধীর জ্বাল প্রয়োজন। বিজয়গুপ্ত বলেন:

নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগের সুপ॥
ধীরে ধীরে জ্বলে অগ্নি এক মত জ্বাল।
কড়ীর বেগেতে রান্ধে কলাইর ডাল॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ১৪৯-১৫০)

আবার চণ্ডীমঙ্গলে দেখি —
রান্ধিল ছোলার সুপ দিয়া তথি খণ্ড।
অলস তেজিয়া জাল দিল দুই দণ্ড॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ১৫০)

আলস্য ত্যাগ করে দুইদণ্ড জ্বাল দিয়ে ছোলার সুপ রান্না করা হচ্ছে। এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে রান্না দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডাল রান্নাতেও শ্রেণিবৈষম্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

৪.২ আমিষ পদ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আমিষ অপরিহার্য। আমিষ সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে — প্রাণীজ আমিষ ও উদ্ভিজ্জ আমিষ। মানুষের প্রয়োজনীয় আমিষের সিংহভাগই প্রাণীজ আমিষ থেকে আসে। বৈদিক যুগেও আমিষের প্রধান উৎস ছিল প্রাণীজ, কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্রাহ্মণ্যবাদী নৈতিকতায় প্রাণিহত্যা নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ফলে আমিষ পরিহারেরও প্রচারণা চলে। কিন্তু বাঙালি উত্তর ভারতীয় এসব সংস্কারে সম্পূর্ণরূপে সায় দেয়নি, এক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটেনি। বাঙালি প্রাচীন, মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগেও আমিষাহার অব্যাহত রেখেছে; মাছ-মাংস না হলে বাঙালির

রসনাতৃপ্তি হয় না। নিরামিষ আহার প্রত্যাখানে হয়তো বাঙালির ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আখ্যান নিহিত রয়েছে।

মাছ

ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারে মাছ খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু সহজলভ্যতার জন্য বাঙালি মাছ খাওয়া ত্যাগ করতে পারেনি। তাই 'মছলিখোর' বাঙালিকে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা কখনোই ভালো চোখে দেখেনি।[৭] আজ বাঙালির পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে মাছ, তাই বলা হয়, 'মাছে ভাতে বাঙালি'। বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে মাছ রান্নার বৈচিত্র্যপূর্ণ উল্লেখ দেখা যায়। মাছ রান্নায় বিভিন্ন সময় বিশেষ মাছের সঙ্গে বিশেষ রকমের সবজি যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, রোহিত বা রুই মাছের সঙ্গে পলতা শাক, মাগুর মাছের সঙ্গে গিমা শাক, শোল মাছের সঙ্গে বেগুন, ইচা বা চিংড়ি মাছের সঙ্গে কলার থোর বা মোচা এবং মুলা মিশিয়ে রান্না করতে দেখা যায়। আবার কিছু মাছ রান্নায় বিশেষ মসলার প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে দেখা যায়। এছাড়া কিছু কিছু মাছ রান্নার প্রক্রিয়া বেশ জটিল, যেমন —

ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈল পাক করি রান্ধে চিঙ্গড়ীর মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
ডুম ডুম কারয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের খৈ॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

খরসুলা মাছ রান্নার জন্য ঝাঁঝযুক্ত সরিষার তেলের প্রয়োজন আবার চিংড়ি মাছ রান্নার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিতরে মরিচগুড়া দিয়ে বাইরে সুতা জড়িয়ে তেলে ভেজে চিংড়ির মাথা রান্না করা হয়। এমন জটিল প্রক্রিয়ায় রান্না, সম্পত্তিবান না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ এত উপকরণ আর সময় 'দিন এনে দিন খাওয়া' প্রান্তিক মানুষের হাতে ছিল না।

রুই-চিতলের কোল ভাজা হলেও কৈ মাছ রান্নায় অধিক মরিচের ঝাল প্রয়োজন, এর সঙ্গে ঝাল বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হতো চই। চই-এর ব্যবহার বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের রান্নার বৈশিষ্ট্য। এছাড়া আরও দেখা যায়—

উপল মৎস্য আনিয়া তাহার কাঁটা করে দূর।
গোল মরিচে রান্ধে উপলের পূর॥
আনিয়া ইলিশ মৎস্য করিল ফালা ফালা।

তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণসাগর কলা॥
শৌল মৎস্য কাটিয়া করিল খানখান।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মান॥
মাগুর মৎস্য আনিয়া কাটিয়া ফেলে বুড়ী।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদামাগুরী॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ১৪৯)

মঙ্গলকাব্যের গৃহিণীর চেঙ্গ বা টাকি মাছ রান্নায় আমের মুকুলও ব্যবহার করা হয়েছে। পিপলিয়া শোল বা গজার মাছ রান্নায় ব্যবহার করা হয়েছে কলার মূল, ইলিশ মাছ রান্নায় কাঁচাকলা যুক্ত হয়েছে। ঝাল বাড়ানোর জন্য চই, গোলমরিচ, আদার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হয়তো মরিচের অপ্রাপ্যতার জন্যই ঝাল বাড়ানোর জন্য মরিচের বিকল্প ব্যবহারের প্রয়াস এতে নিহিত আছে।

মধ্যবাংলার কবি রায়বিনোদ তাঁর *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে বেশকিছু মাছ রান্নার উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, ইচা (চিংড়ি), ইলিশ, চিতল, ফলি, বাচা মাছ ছাড়াও রুই মাছের সঙ্গে সুক্তা মিশিয়ে রান্না করা হচ্ছে। আবার কই মাছের সঙ্গে পিপলির ঝোল রান্নার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, ঝাল বাড়ানোর জন্য বিশেষ মরিচের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

রাঢ় বাংলার কবি মুকুন্দরাম, জমিদারের সভাসদ ছিলেন; তাঁর রান্নার বিবরণে বনেদিপনা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়:

কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল।
রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥
... ...
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ।
মুঠো নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস॥
বদরি শকুল মীন রসাল মুসরি।
পণ চারি ভাজে রামা সরল-সফরী॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ১৫০)

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দেখা যায়, চিতল-রুই মাছের ব্যঞ্জন রান্না করা হলেও কৈ, বদরি, শকুল, সফরী (পুঁটি) প্রভৃতি মাছ ভাজা হয়; মাছ ভাজার সময় ক্ষেত্রবিশেষে আদারস মেশানোরও প্রয়োজন হয়। আবার চিংড়ি মাছের বড়া তৈরি করা হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে মাছেরও কৌলিন্য আছে, সব মাছ সবাই খায় না। কারণ 'যেসব মাছ গর্তে কাঁদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন, বাণ মাছ), কদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁশ নাই সেসব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।' (নীহাররঞ্জন, ১৪০৭: ৪৪৬)। এছাড়া সহজলভ্য কিছু মাছ দরিদ্রের হাতের নাগালে

ছিল, যেগুলো অভিজাতদের পাতে স্থান পেত না। তবে মাঝে মাঝে অভিজাতদেরও সহজলভ্য সেসব মাছ খেতে দেখা যায়, কিন্তু রান্নার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে শুধু অন্ন নয়, বিভিন্ন প্রকার আমিষ রান্নারও বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র এমন এমন মাছের নাম উল্লেখ করেছেন যার অনেকগুলোই এখন বিলুপ্ত। পাশাপাশি এ কাব্যের রন্ধনপ্রণালিতে মোগলাই রান্নার প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্র বলেন:

কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাটালের বীজে ঝোল॥
... ...
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌল মাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক।
(ভারতচন্দ্র, ১৪০৫: ১০৪)

ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেখা যায় ঝাল, ঝোল, ভাজা বিভিন্নভাবে মাছ রান্না করা হয়েছে। এখানে দেখা গেল, মাছের তেল দিয়ে বিশেষ ধরনের শাক রান্না করা হচ্ছে, যা তেলশাক নামে পরিচিত। এছাড়া একাব্যে পঁচা মাছ রান্নারও উল্লেখ দেখছি, যদিও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে তা নিষিদ্ধ; তবে, 'টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা সিহুলী বা শুকনো মাছ খাইতে ভালোবাসিত।' (নীহাররঞ্জন, ১৪০৭: ৪৪৫)। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কাছিমের ডিম রান্নার উল্লেখ রয়েছে; এই ডিম গঙ্গাফল নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্রের এই বিবরণ যতটা না রান্নার বিবরণ, তার চেয়েও বেশি মাছের সংখ্যা ও নাম উল্লেখের প্রয়াস বললে অসংগত হয় না।

মাছের শ্রেণিভেদে রান্নারও রকমফের হয়ে থাকে, ছোট মাছ একভাবে রান্না করা হয় আবার বড় মাছ রান্নার ক্ষেত্রে ভিন্ন উপাদান ও প্রণালি অনুসৃত হয়। এক্ষেত্রে রাঁধুনির দক্ষতা প্রধান ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন বলেন:

বাছো বানিয়ার ঝিউ রন্ধন ভাল জানে।
ক্ষুদ্র মৎস্য ভাজিয়া জামির দিয়া সানে॥
নানা ব্যঞ্জন রান্ধে আর ভাজে বড়া।
তার পাছে রান্ধিল মৎস্যের বড় মুড়া॥
আম্র দিয়া রান্ধে বালী পুরাণ কাতল।
কুষ্মাণ্ড তেতলি দিয়া করিল অম্বল॥
(জগজ্জীবন, ১৯৬০: ২১৭)

মাংস

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আমিষ বর্জন করে নিরামিষাশী হওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিলেও বাঙালির মাংসের প্রতি আগ্রহ কমেনি। এ আগ্রহের জন্যই ভবদেব ভট্ট মাংস খাওয়ার পক্ষে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উল্লেখ-উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন—

> ইহাদের (আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী) নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী, তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনও দোষ স্পর্শে না। (নীহাররঞ্জন, ১৪০৭: ৪৪৫)

খাদ্যবস্তু পর্যাপ্ত হলে সেখানে নির্বাচনের প্রসঙ্গ আসে, কিন্তু যখন অভাব দৃশ্যমান হয় তখন বাছ-বিচারের প্রসঙ্গ আসে না। অভাব প্রান্তিক মানুষের নিত্যসঙ্গী; তাই তারা জীবনের প্রয়োজনেই খাদ্য সন্ধান করেছে, ফলে তাদের কাছে বাছ-বিচারের গুরুত্ব ছিল না। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তারা মাংস খেয়েছে কিন্তু সে মাংসে ঘি-মসলার সংযুক্তি অকল্পনীয় ছিল। কাঁচা, পোড়া বা সিদ্ধ মাংসই তাদের আহার ছিল, ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিতে তারা মনুষ্যেতর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মৃগয়াজীবনের অবসানের পর মাংস যখন সবার হাতের নাগালে রইল না, তখন মাংসের অর্থমূল্য প্রচলিত হয়েছে। ফলে ধনবানই কেবল মাংস ভোজনের অধিকারী হয়েছে। সেই মাংসের স্বাদ বাড়ানোর জন্য তাতে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র রকমের মশলা। মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন প্রাণীর মাংস রান্নার উল্লেখ রয়েছে, যা মাংসের প্রতি বাঙালির আকর্ষণের সাক্ষ্য বহন করে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় জিরা, মরিচ ছাড়াও ভাজা নারিকেল ব্যবহৃত হচ্ছে মাংস রান্নায়:

> জিরামরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল।
> মসল্লা বাটিতে হাতে তুলে নিল শিল॥
> মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
> ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল॥
> ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
> ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম॥
> (বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

ছাগমাংস বেশ জনপ্রিয় ছিল দেখা যায়; সহজপ্রাপ্যতা এর কারণ হতে পারে। আবার সংস্কারের কারণে গোমাংস না খাওয়ার প্রবণতা থেকেও ছাগমাংসের গুরুত্ব বাড়তে পারে। এ জনপ্রিয়তার আরও উল্লেখ দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে; তিনি ছাগমাংসের ঝাল, ঝোল ছাড়াও কালিয়া, দোলমা, সেকচি, সমসা, সীকভাজা প্রভৃতি রান্নার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে মাংস রান্নায় বৈচিত্র্য এসেছে; সম্ভবত ততদিনে মুসলমান বিজয়ের প্রভাব বাঙালির রান্নাঘরে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই কালিয়া, দোলমা, কাবাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মাংস রান্নার বিবরণ দেখা যায়।

আমিষ-নিরামিষ রান্নায় বিভিন্ন প্রকার মসলার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, যথা হিং, জিরা, আদা, গোলমরিচ, হলুদ, মরিচ, চই, পিপুল, ধনিয়া, কটু বা সরিষার তেল, সরিষা, তিল প্রভৃতি ব্যবহৃত হলেও পেয়াজ-রসুন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বেদ-উপনিষদও পেয়াজ সম্পর্কে নিশ্চুপ। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, পেয়াজ এবং রসুন উভয়ই উত্তেজক খাবার হওয়ায় তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। মধ্যযুগের রান্নায় পেয়াজ-রসুন ব্যবহৃত না হওয়া প্রসঙ্গে পিনাকী ভট্টাচার্য বলেন:

> ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে মাংস খাওয়ার চল। তাতে শাস্ত্রের অমত ছিল না। কিন্তু পেঁয়াজ আর রসুন ম্লেচ্ছ খাবার, তার ব্যবহার অশাস্ত্রীয়। এদের বদলে হিং দিলে, স্বাদটা প্রায় একই থাকত। খাবারে বোটকা গন্ধও হত না। (পিনাকী, ২০১৮: ১২-১৩)

এছাড়া ঝাল বাড়ানোর জন্য আদা, গোলমরিচ, চই ও পিপুলের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। মরিচের ব্যবহার থাকলেও তা অধিক নয়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কলম্বাসের হাত ধরে মরিচ আমেরিকা থেকে ইউরোপে আসে এবং সেখান থেকে পর্তুগিজদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মরিচের আগমন। তাই ষোড়শ শতকের পূর্বের কোনো রচনায় মরিচের উল্লেখ নেই। আর মরিচের অপ্রাপ্যতার জন্যই হয়তো বিকল্প ঝালের উৎস সন্ধান করা হয়েছিল। আবার বিভিন্ন প্রকার সবজির উল্লেখ থাকলেও বাঙালির নিত্যদিনের সঙ্গী আলুর নাম-গন্ধও কোথাও নেই; কেননা ভারতবর্ষে সপ্তদশ শতকের আগে আলুর আবির্ভাব ঘটেনি।

অম্বল

ভোজনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো অম্বল বা টক। মঙ্গলকাব্যগুলোতে যেসব খাবার রান্নার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর সবই প্রায় গুরুপাক। তাই হজমের সুবিধার জন্য খাদ্যতালিকায় টকজাতীয় খাবার অর্থাৎ অম্বল রাখা প্রয়োজন ছিল। অম্বল রান্নার উপাদানে ব্যাপক বৈভিন্ন্য লক্ষ করা যায়। রায়বিনোদের কাব্যে রুই মাছের ডিম দিয়ে অম্বল রান্না করতে দেখা যায়:

> আম দিয়া শৌল রান্ধে তৈতৈলত ওল।
> রোহিতের ডিম্বে রান্ধে অম্বলের ঝোল॥
> (রায়বিনোদ, ১৯৯৩: ২৭৮)

পিঠা ও মিষ্টান্ন

আধুনিককালে খাবারের শেষপাতে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হয়, যাকে বলা হয় ডেজার্ট। মধ্যযুগেও নিরামিষ-আমিষ খাবার খাওয়ার পর পরিবেশিত হতো মিষ্টান্ন, দই এবং পিঠা। মঙ্গলকাব্যগুলোতে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ও পিঠা তৈরির বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষ দক্ষতা না থাকলে পিঠা তৈরি করা যায় না, যে নারী যত বেশি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পিঠা বানাতে পারত তার গুণপনার প্রশংসাও ততটাই হতো। *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে দেখা যায়:

মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স॥
দুগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ।
রন্ধন করিয়া হইল হরষিত মন॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৭)

রায়বিনোদের কাব্যে যেসব পিঠার উল্লেখ রয়েছে তা তৈরির প্রক্রিয়া বেশ জটিল বলেই মনে হয়। যেমন—

নলের চুঙ্গিত কন্যা পিঠালি ভরিয়া।
চন্দ্রকাইট পিঠা কৈল সুপক্ব করিয়া॥
চিনি দিল তার মধ্যে জেন লাগে মিঠা।
পাট-আঁশ দিয়া মধ্যে রান্ধে পুলি পিঠা॥
(রায়বিনোদ, ১৯৯৩: ২৭৮)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায়, পিঠায় বৈচিত্র্য এসেছে। লুচি, পুরি, চূষী, রুটি, রামরোট, মুগের সামলি, কলাবড়া, পাপড় প্রভৃতি পিঠার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বের কাব্যগুলোতে নেই। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি, তাঁর বর্ণিত রন্ধনপ্রণালিও রাজকীয়, ফলে মোগলাই খাবারের প্রবেশ সেখানে সহজেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ততদূর প্রসারিত হতে পারেনি।

মিষ্টান্নের মধ্যে অন্যতম পায়েস, অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, শুধু চাল দিয়ে নয়, চিনা, ভুরা, বাজরা প্রভৃতি দিয়েও পায়েস রান্না করা হচ্ছে—

পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
(ভারতচন্দ্র, ১৪০৫: ১০৬)

মিষ্টান্নের আরেক নাম পরমান্ন। এ নাম দেখে বোঝা যায়, অভিজাত শ্রেণির সহজলভ্য হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তা পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল।

ভাত

ধান যেখানে প্রধান ফসল, খাবার হিসেবে ভাতের আধিপত্য সেখানে অনিবার্য; তাই বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। কিন্তু ভাতেরও রূপভেদ আছে এবং ভাতেই বিধৃত আছে জাতি পরিচয়[৮], সবাই সব ধরনের ভাত খায় না। সর্বপ্রকার রান্নার মধ্যে ভাত রান্নাই সহজতর। ধান থেকে চাল বের করে পানিতে সিদ্ধ করলেই ভাতে পরিণত হয়। ভাত রান্নার জন্য চালের দেড়গুণ পরিমাণ পানি দিতে হয়। ভাত একসময় হাঁড়ির মধ্যে

ফুটতে থাকে, এরপরে জলীয় অংশ যা ফেন নামে পরিচিত, তা ফেলে দিতে হয়, তাহলে ভাত ঝরঝরে হয়। ফেন না ফেললেও চলে, তবে সে ভাত আঠালো হয়ে যায়। ভাত রান্নার বিবরণে দেখা যায়—

চাউল পাখালে বেহুলা ঘটের দিয়া পানী।
নেতের আচল দিয়া জ্বালিল আগুনি॥
তিন দিকে দিল বেহুলা তিন নারিকেল।
চাউল প্রমাণে বেহুলা হাঁড়িতে দিল জল॥
... ...
হাঁড়ীর মধ্যে ফুটে ভাত গড় গড় ডাকে।
হাতের অঙ্গুলী দিয়া লাড়ে ঘন পাকে॥
জল শেষ হইল ভাত নিগারিল।
হাঁড়ি হইতে ভাত ভূমে নামাইল॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ১৯৬)

চাল থেকে ভাত হয়, আর চাল হয় ধান থেকে। এদেশে বিভিন্ন প্রকার ধান উৎপাদিত হয়েছে। স্বাদে-গন্ধে-আকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার ধানের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অবশ্য উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণিই সরু, সুস্বাদ এবং সুগন্ধী ধানের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে চিরকাল; ফলে তা কখনোই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছায়নি, মোটা চালের ভাতেই তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* যেন ধানের শব্দকোষ, এমন কোনো ধান নেই যার উল্লেখ তিনি করেননি। যেমন— আসু, বোরো, আমন, দলকচু, ওড়কচু, ঘিকলা, পাতরা, মেঘহাসা, কালামনা, রায়, পানিতরা, কালিন্দী, কনকচূর, ছায়াচূর, পুদি, শালি, হরিলেবু, গুয়াখুরি, সুদি, বিশালী, পোয়াল, বিড়া, কলামোচা, কৈজুড়ি, খাজুরছড়ী, চিনা, ধলবার, দাদুশাহি, বাঁশফুল, ছিলাট, করুচি, কেলেজিরা, পদ্মরাজ, দুদসার, লুচি, কাঁটারাঙ্গি, কোঁচাই, কপিলাভোগ, বাঁশগজাল, বাজাল, মরীচশালী, ভুরা, বেনাফুল, কাজলা, শঙ্করচিনা চিনিসমতুল, মাকুমেটে, মষিলোট, শিবজটা, দুধপনা, গঙ্গাজল, সুধা, দুধকমল, খড়িকামুটি, বিষ্ণুভোগ, গন্ধেশ্বরী, গন্ধভার, পায়রারস, বাঁশমতি, কদমা, কুসুমশালি, রমা, লক্ষ্মী, আলতা, দানারগুঁড়া, জুতী গন্ধমালতী, লতামউ প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু ধান আছে যা বাংলা অঞ্চলে উৎপাদিত হয় না, অতএব সেগুলো বাইরে থেকে আনতে হয়েছে। ভবানন্দ মজুমদারের মতো পরশ্রমজীবী জমিদারের জন্য এই ধানের চালের যোগান কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যারা খেটে খায়, সেই পরিশ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জন্য এমন চাল কল্পনার বিষয় মাত্র। আবার এদেশে যে ধান উৎপাদিত হয়েছে, তার উৎকৃষ্ট অংশ জমিদারের গোলায় উঠবে, যুগপরিবেশ বিবেচনায় সেটাই স্বাভাবিক।

সামন্ততন্ত্রের জঠর থেকে জন্ম নেওয়া বণিক সমাজ, বিত্তের মাপকাঠিতে সমাজের শীর্ষে উপনীত হয়। তাদের যাপিত জীবনও সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর থেকে পৃথকীভূত হয়ে ওঠে শীঘ্রই। এ অভিজাত শ্রেণির রান্নাও সাধারণের রান্নার মতো নয়।

পোড়া, সিদ্ধ, কটুতৈল অতিক্রম করে এদের রান্নায় প্রবেশাধিকার ঘটে ঘিয়ের। মাছ-মাংস 'ঘৃতে জবজব' করে রান্নার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকাঠামোর অংশীদার হয়ে ওঠার চলমান প্রক্রিয়া ঘোষিত হতে থাকে।

ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত অর্থনৈতিক সুখ, সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার পরিচয় বহন করে। সমাজে চিরকালই কিছু মানুষ ছিল যাদের অন্নের প্রাচুর্য ছিল আবার এর বিপরীতে ক্ষমতাকাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে যারা অবস্থান করেছে তাদের মধ্যে অন্নাভাব লেগেই ছিল, সংখ্যাগত দিক থেকে এরাই অধিক। এরা গরম ভাত খেতে পায় না, এদের ভাত রান্নার প্রক্রিয়া বেশ আলাদা। বিজয়গুপ্ত জানাচ্ছেন, এক দরিদ্র মায়ের সন্তানের খাবারের কথা। পান্তাভাত, এ ভাত তৈরিরও পদ্ধতি আছে। অসহায় দরিদ্রের পক্ষে প্রতিদিন গরম ভাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, বাধ্য হয়েই জলযুক্ত পান্তা ভাতই ক্ষুধা নিবারণের উপায় হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত পেটে শীতল পান্তা ভাতও মুখরোচক হয়ে ওঠে। বাসি ভাতের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যঞ্জন হিসেবে যুক্ত হয় মুলা-সরিষার তরকারি, তাও বাসি, টকে যাওয়া। প্রান্তিকের কণ্ঠে কবি জানান:

বিকালে রান্ধিয়া ভাত থুয়ে থাকে পাকে॥
যত্ন করি রাখে ভাত পাকে দিয়া জল।
পরদিন খাই ভাত অত্যন্ত শীতল॥
খাইয়া ক্ষুধার কালে বড় প্রীতি পাই।
ঘরে গিয়া সেই অন্ন নিত্য নিত্য খাই॥
... ...
বাসি ভাত ব্যঞ্জন জিহ্বায় রস বাসে।
মূলায় সরিসা অম্বল ভাত স্বাদ আসে॥
উত্তম তণ্ডুলের অন্ন গন্ধেতে অধিক।
অমৃতের তুল্য রস পাইলাম খানিক॥
(বিজয়গুপ্ত, ২০০৯: ৯৬)

৫. পরিবেশন ও ভোজন

রন্ধনের পর পরিবেশন, এরপরই খাবার গ্রহণের পালা। এখানেও মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয় নারীকেই। যদিও খাদ্যগ্রহণের মধ্যেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ছাপ বিদ্যমান। কেউ কেউ ভোজন করেন, কেউ সেবা গ্রহণ করেন কেউবা শুধুই খায়। শুধুই খায় যারা, রসনাবিলাস তাদের জন্য নয়, উদরপূর্তিই তাদের উদ্দেশ্য। তাই এরা ঠিক ভোজন গ্রহণ করতে বসে না; কেননা—

> বসারও শ্রেণিভেদ আছে এবং বসার অনুরূপে আসে খাবার। বসার পর আসবে পাতা। এখন পাত্র বা প্লেট। আসন ও পাতা— আসন-পাতা।... শানকি ও প্লেটে শ্রেণিভেদ স্পষ্ট। (সিরাজ, ২০২১: ভূমিকা ১)

খাবার গ্রহণ করার জন্য প্রথমেই ভোজনস্থল নির্বাচন করতে হয় এবং বসার জন্য শ্রেণিভেদে আসনের ব্যবস্থা দেখা যায়। কেউ উপবেশন করেন আবার কেউ পাত পেরে বসে। অভিজাত শ্রেণির জন্য সোনার থালায় ভাঙ, রূপার থালায় ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা থাকলেও, সবার জন্য তা জোটে না। ব্যাধ কালকেতুর সন্তুষ্টির জন্য তার স্ত্রী ফুল্লরাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দেখা যায়:

সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা।
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥
(মুকুন্দরাম, ২০০১: ৪৬)

দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু এতটাই দরিদ্র যে ভাত ভিজিয়ে আমানি করার জন্য প্রয়োজনীয় পাত্রটুকুও তার নেই, অগত্যা মাটির গর্তের আমানি তাকে ভোজন করতে হয়। এমনকি তার ভোজনের জন্য মাটির পাথরা এবং ব্যঞ্জনের জন্য খাপড়া অর্থাৎ মাটির পাত্রের ভাঙা অংশ। ক্ষমতাকাঠামো অনুয়ায়ী, কালকেতুর অবস্থান প্রান্তিক, আবার ফুল্লরা কালকেতুর অধীন।

রান্না যত সুস্বাদুই হোক না কেন, যদি সুচারুভাবে পরিবেশিত না হয় তবে খাবারে তৃপ্তি আসে না। খাবার পরিবেশন ও খাবার গ্রহণেরও ধারাবাহিকতা আছে। নারীকে এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকতে হয়, তাই খাবার গ্রহণের শুরুতে সুক্তা বা তিতা শাক পরিবেশিত হয়, যা খাদ্য হজমে সহায়ক। শাকের পর অন্যান্য নিরামিষ ব্যঞ্জন এবং তারপরে আমিষ তথা মাছ-মাংস পরিবেশিত হয়। এরপরে অম্বল বা টক খাওয়া হয়, এটাও খাবার হজমের পক্ষে উপকারী মনে করা হয়। সর্বশেষ পাতে আসে মিষ্টান্ন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আচমন করার পর অনেক সময় পান-সুপারি পরিবেশনের চিত্র দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় ধনপতি সওদাগরের ভোজনের দৃশ্য:

শিব স্মঙরিআ কৈল দুই আচমন।
খুল্লনা কনক থালে জোগায় ওদন॥
প্রথমে সুক্তা ঝোল ঘণ্ট সাক সূপ।
মীন মাংস ভোজনে আপনা বাসে ভূপ॥
ঘৃতে জবজব খায় মীন মাংসবড়ি।
বাদ কর‍্যা ভাজা কই খায় তিন কুড়ি॥
অম্বল খাইয়া পিলা জল ঘটী ঘটী।
দধি খায় ফেনি তার করে মটমটী॥
মোঁনে ভোজন সাধু করে বার মাস।
ভোজন করিআ সাধু করে উপহাস॥
(সুকুমার, ২০০১: ১৬১)

যেহেতু রান্নার সঙ্গে নারী-প্রেম-যৌনতা অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং পুরুষ স্বভাবতই শিশ্নোদরপরায়ণ তাই উদর নিবৃত্তির পর তার প্রয়োজন হয় দাম্পত্যপ্রেমের। তাই ধনপতি সওদাগরকে দেখা যায় ভোজনবিলাসের পর প্রফুল্ল মনে খুল্লনার সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে মগ্ন হতে। নারীও শেষপর্যন্ত পুরুষের সেবা করাকে নিজের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত না হওয়ায় পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোনো দ্রোহ বা প্রতিবাদ অথবা স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

রান্নার উদ্ভব ঘটেছিল উদরপূর্তির প্রয়োজনে, সচ্ছলতা আসার সঙ্গে সঙ্গে রান্না উদরের সঙ্গে রসনাতৃপ্তিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই থেকে রান্না নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছেই। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা থাকে কোনো জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষমতাধর্মের ইতিবৃত্তান্ত। তাই 'খাদ্য এখন বার্তা, খাদ্য এখন আলোচ্য। খাদ্য নবযুগের নব্য সামাজিকতা।... খাদ্য এখন সাহিত্যের মতো, শিল্পের মতো, পোশাক পরিচ্ছদের মতো রীতিমতো চর্চার বিষয়।।' (শ্রীপান্থ, ২০০৪ : ৭২)। মঙ্গলকাব্যে বিধৃত রন্ধনপ্রণালিতেও সেকালের বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার নিদর্শন ধরা আছে। রান্নার উপকরণ আর প্রণালির দিকে দৃষ্টি দিলে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। আবার অন্যদিকে রান্নার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিজাত ধনী-দরিদ্রের সামাজিক ব্যবধান এবং মঙ্গলকাব্যে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে রন্ধনকর্ম পর্যবেক্ষণ বেশ সহায়ক। মধ্যযুগে খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরতা এবং রান্নার অধিকার ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস, নারীর অধিকারহীনতা ও অনিশ্চিত জীবনব্যবস্থার স্মারক। নারী কখনও মমত্ববোধে জাগ্রত মাতৃসত্তায় উজ্জীবিত কখনও আবার প্রেমময়ী সত্তায়, তবে উভয়ক্ষেত্রেই নারী প্রাণদায়িণী শক্তি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার প্রয়াসী।

টীকা

১. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কাল-সহকারে, মনুষ্য-সমাজের উন্নতির সহিত খাদ্যাদির বিচার এবং রন্ধনের পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে।' (১৩১৩: ৭)

২. মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'ইহা স্থির যে, মানবজীবনের প্রারম্ভে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ নিরামিষাশী ছিলেন। যুগপরিবর্ত্তনের ফলে, মানবের জন্মের বহুদিন পরে, গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ দেশসমূহ ক্রমশঃ অথবা সহসা, শীতপ্রধান হইয়াছিল। তাহার ফলে আদিম মানবের লীলাক্ষেত্রসমূহে, জীবনধারণের উপযোগী ফলমূলের অভাব হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের যুগে আদিম মানবকে বাধ্য হইয়া ফলমূলের পরিবর্ত্তে পশুমাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।' (১৩৩০: ৩)

৩. প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, ১৩০৭: ৫৯

৪. সিরাজ সালেকীন বলেন, 'বঙ্গীয় সমাজে পুরুষেরা সাধারণত রান্নাঘরে ঢোকে না। রান্না নারীরই কর্ম ও গুণপনা, এই ভেবে পুরুষ নিশ্চিন্ত।' (২০২১: ২৮)

৫. বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় জানান, 'রন্ধনবিদ্যার প্রতি অনুরাগ নারী জাতির রক্ত মাংসে যেন মিশ্রিত; এজন্য দেখা যায় হিন্দু বালিকা অতি শৈশবাবস্থায় ক্রীড়াচ্ছলে ধুলামাটি লইয়া, রন্ধনবিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকে।' (১৩১৩: ২-৩)

৬. 'তার (পুরুষের) অভিজ্ঞতায়, সে স্ত্রীকে দু-চারটি অলঙ্কার উপহার দেবে, কিছু মিষ্টি কথা বলবে আর তাতেই তার স্ত্রী (নারী) অত্যন্ত খুশি হয়ে স্বামীর জন্য ব্রত-উপবাস করবে, সর্বদা স্বামীর চিন্তায় মগ্ন থাকবে এমনকি তারই চোখের সামনে স্বামী পরনারী আসক্ত হবে — আর স্ত্রী এই সব কিছু মেনে নেবে।' (মুন্সী মহম্মদ, ২০১৮: ৪১৮)

৭. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না: অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং স্পষ্ট।' (১৪০৭: ৪৪৫)

৮. সংসদ সমার্থশব্দকোষ থেকে ভাত শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ উল্লেখ করে সিরাজ সালেকীন বলেন, 'সবগুলো ভাত নয়, তবে ভাত-সম্পর্কিত। এই ভাতে জাতি পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য আছে; গ্রহণ-বর্জনের পালাও এতে লিপিবদ্ধ না থেকে পারে না। কতগুলো শব্দ; কেবলই শব্দ? শব্দ কি স্মৃতিধর নয়? জীবাশ্মে যেমন থাকে প্রতিবেশ ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত, তেমনি থাকে শব্দেও।' (২০২১: ১৪)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অদিতি ফাল্গুনী, ২০১৪। 'নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, লুপ্ত অতলান্তিক ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ', বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২। *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

অশোক মুখোপাধ্যায়, ২০১১। *সংসদ সমার্থশব্দকোষ*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

গোলাম মুরশিদ, ২০০৬। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা।

জগজ্জীবন ঘোষাল, ১৯৬০। *মনসামঙ্গল*, আশুতোষ দাস ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০৭। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী, ১৩০৯। *পাক-প্রণালী*, টালা ৩৬ নং বনমালী চাটুর্জীর স্ট্রীটে কৃষ্ণভাবিনী প্রেস, কলিকাতা।

পিনাকী ভট্টাচার্য, ২০১৮। *খানাতল্লাশি*, আনন্দ, কলকাতা।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, ১৩০৭। *আমিষ ও নিরামিষ আহার*, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা।

বিজয়গুপ্ত, ২০০৯। *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল*, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, ১৩০৪। *পাক-প্রণালী*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা।

বৃন্দাবনদাস, ১৯৫৫। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, ১৪০৫। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ২০০১। *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লী।

মুন্সী মুহম্মদ ইউনুস, ২০১৮। 'নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : নিবিড় পাঠ', নবেন্দু সেন সম্পাদিত *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, রত্নাবলী, কলকাতা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০। *বাঙ্গালার ইতিহাস* ১, মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা।

রায়বিনোদ, ১৯৯৩। *পদ্মাপুরাণ*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রাশিদা আখতার খানম, ২০১৪। 'নারীবাদী তত্ত্ব ও মতিজানের মেয়েরা', বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা।

শঙ্কর, ২০১১। *বাঙালির খাওয়াদাওয়া*, সাহিত্যম্, কলকাতা।

শিশিরকুমার দাশ, ২০০৯। *আরিস্টটল কাব্যতত্ত্ব*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

শ্রীপান্থ, সম্পা. ২০০৪। *পাকরাজেশ্বরঃ ও ব্যঞ্জন রত্নাকর*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

সিরাজ সালেকীন, ২০২১। *খাদ্য, কিন্তু আহার্য নয়*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০০২। *প্রবন্ধসংগ্রহ* ২, গাঙচিল, কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক, সম্পা. ২০১৩। *মৈমনসিংহ গীতিকা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।